অধ্যায় ৭

আমাদের চারপাশের পরিবর্তন

অধ্যায় ৭ আমাদের চারপাশের পরিবর্তন

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ পরিবেশের বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন
- ☑ ধাতু সংরক্ষণের গুরুত্ব
- ☑ সালোকসংশ্লেষণ, পানিচক্র, কার্বনচক্র, অক্সিজেনচক্র
- ☑ রাসায়নিক পরিবর্তনের বিভিন্ন বাস্তবিক প্রয়োগ

আমাদের চারপাশে প্রতিমুহূর্তে নানাকিছু ঘটে যাচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে কোনোটা আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়, কিছু অপ্রয়োজনীয়, কিছু আবার ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রকৃতিতে ঘটা এইসব নানা ঘটনায় বিভিন্ন পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

ভৌত পরিবর্তন: গলন এবং স্ফুটন

তোমরা সবাই কখনো না কখনো বরফকে গলে পানি হতে দেখেছ। তোমরা সবাই জানো, পানি এবং বরফ একই পদার্থ, সেগুলো আলাদা কিছু নয়, শুধু সেগুলোর অবস্থা আলাদা। যখন এটি পানি হিসেবে থাকে তখন এটি তরল এবং যখন বরফ হিসেবে থাকে তখন এটি কঠিন।

আবার তোমরা সবাই জানো পানিকে তাপ দিলে পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সেটি ফুটতে শুরু করবে। তোমাদের কাছে পানির স্ফুটন কি একটি ভৌত পরিবর্তন মনে হয়? হ্যাঁ, অবশ্যই তা একটি ভৌত পরিবর্তন, কারণ তখন শুধু এটি তরল থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে। এটি কোনো নতুন পদার্থে পরিণত হয়নি এবং এর বৈশিষ্ট্যেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। তোমরা আগেও পদার্থের ভৌত পরিবর্তন সম্পর্কে জেনেছ। সুতরাং, বলা যায়, পদার্থের যে পরিবর্তনে শুধু অবস্থা বা আকৃতির পরিবর্তন হয়, কিন্তু নতুন কোনো ধরনের পদার্থের সৃষ্টি হয় না এবং ধর্ম একই থাকে, তাকে ভৌত পরিবর্তন বলে।

বরফের পানিতে পরিণত হওয়া পদার্থের একটি ভৌত পরিবর্তন।

রাসায়নিক পরিবর্তন: লোহার মরিচা

তোমরা আগের অধ্যায়ে লোহার মরিচা সম্পর্কে পড়েছ এবং জেনেছ এক টুকরা লোহা বাষ্পের উপস্থিতিতে বাইরে ফেলে রাখলে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং তাতে মরিচা ধরে এবং তখন সেটি ক্রমাগতভাবে ক্ষয়ে যেতে থাকে। সুতরাং, লোহাতে মরিচা ধরা একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। মরিচা কীভাবে সৃষ্টি হয় সেটা বোঝার জন্য নিম্নোক্ত কাজটি করতে পারো।

কাজ: একটি পানি দ্বারা অর্ধপূর্ণ পাত্র নাও। সাবধানে কয়েকটি পেরেক পানির মধ্যে ছেড়ে দাও যেন কোনো কোনোটি পুরোপুরি ডুবে থাকে, কোনো কোনোটি অর্ধেক পানির নিচে এবং অর্ধেক পানির উপরে থাকে। পাত্রটি ২/৩ দিন রেখে দাও। পেরেকগুলোতে কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পেয়েছ? হ্যাঁ, তুমি দেখতে পাবে যে, পেরেকগুলোতে মরিচা ধরেছে, কোনোটতে বেশি, কোনোটাতে কম। তুমি কি কোনোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে কেন কোনোটাতে বেশি এবং কেন কোনোটাতে কম?

এখন চিন্তা করে দেখতে পারো যে, লোহাটিতে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে, লোহা ও পানির বিক্রিয়ায় ফেরিক অক্সাইড তৈরি হয়েছে। এই ফেরিক অক্সাইডকে মরিচা বলে। এখানে স্পষ্ট যে, লোহা ফেরিক অক্সাইড নামক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়েছে। ফেরিক অক্সাইড বা মরিচা খসে খসে পড়ে এবং এভাবে লোহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই বলা যায় যে মরিচা ধরার প্রক্রিয়াটি লোহার ক্ষতিসাধন করে।

এরকম এক বা একাধিক পদার্থের সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

তামার তৈরি স্ট্যাচু অব লিবার্টি তৈরি করার সময়ে, এবং বর্তমানে

লোহার মতো সকল ধাতু সমানভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তার উপরে যে অক্সাইডের স্তর তৈরি করে, সেটি যথেষ্ট শক্ত এবং সেটি ভেতরের অ্যালুমিনিয়ামকে রক্ষা করে। বাতাসে দূষিত পদার্থ থাকলে সেগুলো তামাকে ধীরে ধীরে আক্রান্ত করে এবং সেটি সবুজ রং ধারণ করে। নিউ ইয়র্কের স্ট্যাচু অব লিবার্টি সে কারণে সবুজ রংয়ের। কিন্তু কিছু ধাতু যেমন সোনা, প্লাটিনাম উন্মুক্ত বাতাসে রেখে দিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এই কারণে এগুলো মূল্যবান এবং বিভিন্ন অলংকার এবং মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া

তোমরা রাসায়নিক পরিবর্তনের একটি সাধারণ পরীক্ষা—যেমন, কার্বনেট যৌগের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতক্ষ করতে পারো। রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং পরিবর্তন বোঝার জন্য নিচের সহজ পরীক্ষাটি করা যেতে পারে।

কাজ: প্রথমে কিছু চক গুড়া করে নাও, তারপর সেগুলো কোনো পাত্রে অথবা একটি চামচে নাও। এবার একটি ড্রপারের সাহায্যে বা অন্যভাবে সেখানে ফোঁটা ফোঁটা ভিনেগার যোগ করো। ভিনেগারে অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকে, কাজেই তোমরা দেখবে ভিনেগারের অ্যাসেটিক অ্যাসিড চকের গুড়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে বুদবুদ তৈরি করছে।

বুদবুদ সৃষ্টির কারণ হচ্ছে চক—যা মূলত ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$), তার সঙ্গে ভিনেগার (অ্যাসিটিক অ্যাসিড) যোগ করার ফলে এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে tকার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে। আমরা বুদবুদ (bubbles) দেখেছি এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের কারণেই।

এটা তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন? অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ উৎপন্ন পদার্থ (ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি) ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিডের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এগুলোর বৈশিষ্টও ভিন্ন।

এই পরীক্ষায় তোমরা চকের পরিবর্তে ডিমের খোসাও ব্যবহার করতে পারো কারণ সেটি ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিপূর্ণ।

প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন

কোনো বস্তুর পরিবর্তনকে আমরা ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়াও প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন এবং অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যে পরিবর্তন স্থায়ী নয়, এবং পরিবর্তিত বস্তুকে

তার ধর্ম ঠিক রেখে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, তাকে প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন বলে। এই ধরনের পরিবর্তনে শুধু বাহ্যিক অবস্থার অথবা আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু নতুন ধরনের পদার্থের সৃষ্টি হয় না। গলন, স্ফুটন, বাষ্পীভবন, শীতলীকরণ, ঘনীভবন, দ্রবীভূতকরণ হলো প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার কিছু উদাহরণ। প্রত্যাবর্তী পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত বস্তুকে এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পূর্বের অবস্থায় ফেরত আনা যায়।

তোমরা আগের একটি অধ্যায়ে তাপ প্রদানের মাধ্যমে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন এবং সেগুলোর প্রসারণের কথা জেনেছ। এই পরিবর্তনগুলো একই সঙ্গে ভৌত পরিবর্তন এবং প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন।

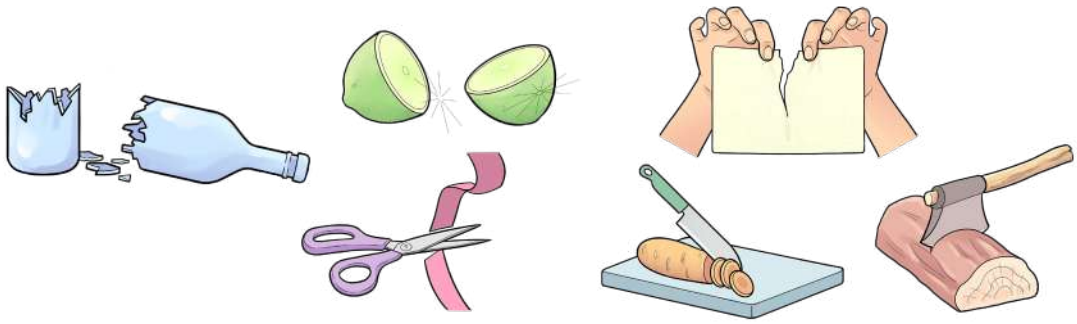

ভৌত পরিবর্তন কিন্তু প্রত্যাবর্তী নয়

অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন

অপরদিকে, যে ধরনের পরিবর্তন স্থায়ী এবং পরিবর্তিত বস্তুকে কোনো প্রকার ভৌত অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না, তাকে অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন বলে। নতুন বস্তুর সৃষ্টি এধরনের পরিবর্তনের অর্ন্তভুক্ত। রান্না করা, পোড়ানো, গুঁড়া করা ইত্যাদি হলো কিছু পদ্ধতি যার ফলে অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যেমন একটি কাঁচা ডিম সিদ্ধ করা হলে সেটিকে কোনোভাবেই আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে, প্রত্যাবর্তী পরিবর্তনগুলো হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন। কিন্তু সকল ভৌত পরিবর্তন কিন্তু প্রত্যাবর্তী নয়। যেমন একটি রবার ব্যান্ড টেনে লম্বা করা যায় এবং সেটি ছেড়ে দিলে আবার সেটি আগের অবস্থায় ফিরে যায়। এটি একটি ভৌত পরিবর্তন এবং একই সঙ্গে প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন। যদি রবার ব্যান্ডটি অনেক বেশি টেনে সেটি ছিড়ে ফেলা হয়, তাহলে সেটি যদিও তখনো একটি ভৌত পরিবর্তন, কিন্তু সেটি আর প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন নয়। উপরের ছবিতে কয়েকটি ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন নয়।

অন্যদিকে রাসায়নিক পরিবর্তনগুলো সব সময়েই অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন, কারণ সেগুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যাবে না।

প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার সাহায্যে পদার্থকে পুনরায় ব্যবহার্য করা

প্রত্যাবর্তী পরিবর্তনের মাধ্যমে প্লাস্টিককে রিসাইকেল (Recycle) বা পুনরায় ব্যবহার করা যায়। পাশের ছবিতে প্লাস্টিক রিসাইকেল চক্র দেখানো হয়েছে। প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন জিনিস যেমন পানির বোতল, খাবার সংরক্ষণের পাত্র ইত্যাদির আকৃতি পরিবর্তন করে নতুন ধরনের পাত্র তৈরি করা যায়। আবার, রিসাইকেল করা প্লাস্টিকের সাহায্যে, বিভিন্ন ফার্নিচার, খেলার মাঠের জিনিসপত্র, ইত্যাদিসহ আরো অনেক কিছু তৈরি করা যায়।

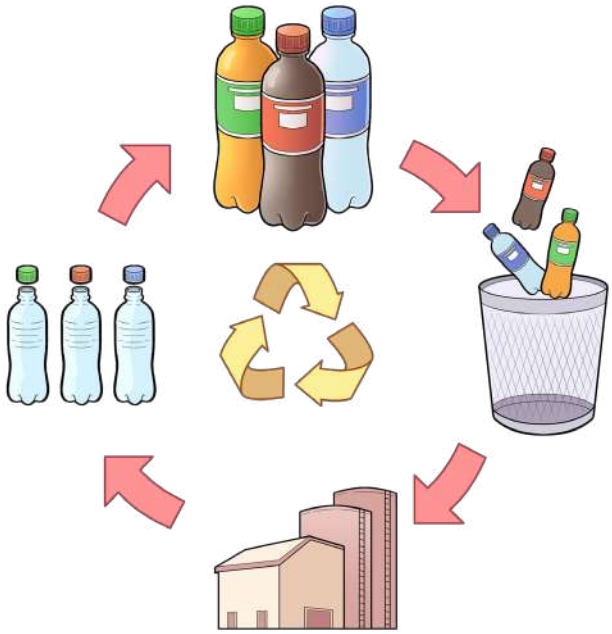

প্লাস্টিক রিসাইকেল চক্র

আমরা সকলেই জানি যে, বিভিন্ন পদার্থকে যতটা সম্ভব রিসাইকেল করে পুনরায় ব্যবহার করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি পরিবেশের আবর্জনার পরিমাণ কমাতে সহায়তা করে। এছাড়া নতুন উপকরণ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে সহায়তা করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কাচ এবং প্লাস্টিকের রিসাইকেল সম্ভব, কারণ উভয়েরই রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো এমন যে তাদের উত্তপ্ত এবং ঠান্ডা করা যায় এবং উত্তপ্ত বা ঠান্ডা করার পরও সেগুলোর বৈশিষ্ট্য একই রকম থাকে।

কাচের মতো কাগজ তৈরির পদ্ধতিও প্রত্যাবর্তী পদ্ধতি এবং কাগজকে রিসাইকেল করা যায়। পৃথিবীব্যাপী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা কাগজ থেকে এ ধরনের রিসাইকেল পদ্ধতির মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার্য কাগজ তৈরি করা হয়ে থাকে। নষ্ট কাগজে পানি এবং কিছু রাসায়নিক পদার্থ যোগ করে এবং পরিষ্কার করাসহ কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে আবার আগের মতো কাগজ তৈরি করা হয়।

ধাতুর ক্ষয় রোধ

ধাতুর তৈরি জিনিস যদি ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকে, তাহলে একসময় তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। আমরা যদি এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হই, তাহলে ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

কাজ: গৃহস্থালিতে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত ধাতুর জিনিসপত্রের একটা তালিকা তৈরি করো এবং কোনটা ক্রামগত ক্ষয় হচ্ছে এবং কোনটা হচ্ছে না তা লক্ষ করো। তোমরা এ সবের কারণ অনুসন্ধান করতে পারো।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, লোহার ক্ষয়রোধের জন্য কীভাবে মরিচা বন্ধ করা যেতে পারে? দৈনন্দিন জীবনে আমরা যদি লোহার তৈরি বিভিন্ন জিনিস, যেমন খন্তা, হাতুরি, হুক, পেরেক ইত্যাদি পানি থেকে দূরে রাখি তাহলে মরিচা থেকে বাঁচানো সম্ভব। এছাড়া, সেগুলোকে তেল অথবা গ্রিজ দ্বারা আবৃত করে রেখেও মরিচা কমানো যায়। তবে সঠিকভাবে মরিচা রোধ করার জন্য গ্যালভানাইজিং করে, রং করে কংবা তড়িৎ প্রলেপনের সাহায্যে মরিচা রোধ করা যায়। বিশেষ প্রয়োজনে সম্ভব হলে মরিচাবিহীন ইস্পাত ব্যবহার করা যেতে পারে।

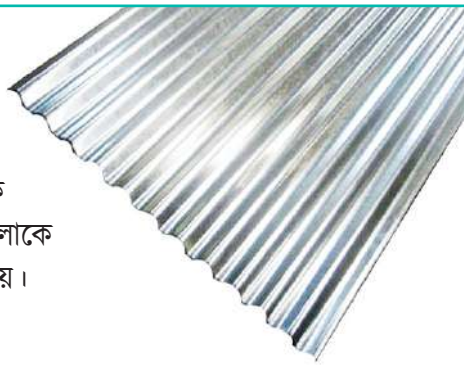

গ্যালভানাইজিং (Galvanizing): আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানান কাজে দস্তা বা জিংক ব্যবহার হয়ে থাকে। এসব কাজের মধ্যে গ্যালভানাইজিংয়ের জন্য দস্তার ব্যবহার অন্যতম। লোহার তৈরি জিনিসের উপর দস্তার প্রলেপ দেয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে। এক্ষেত্রে দস্তার প্রলেপ বাধা তৈরি করে লোহাকে পানি এবং অক্সিজেন থেকে রক্ষা করে, যার ফলে মরিচা ধরে না। ধাতুগুলোকে দস্তার পরিবর্তে টিনের প্রলেপ দিয়েও মরিচা থেকে রক্ষা করা যায়।

তড়িৎ প্রলেপন (Electroplating): তড়িৎ প্রলেপন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে অধিক সক্রিয় ধাতুর উপরে তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে কম সক্রিয়া ধাতুর একটি প্রলেপ সৃষ্টি করে অধিক সক্রিয় ধাতুকে মরিচা থেকে রক্ষা করা হয়। লোহার তৈরি জিনিসকে সাধারণত, তামা, ক্রোমিয়াম, টিন, অথবা নিকেল দিয়ে তড়িৎ প্রলেপন করা হয়। এর মাধ্যমে গহনার সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও বাড়ানোর যায় এবং কাটলারি ও মোটর যন্ত্রাংশের স্থায়িত্বও বৃদ্ধি করা যায়। এটি শুধু ধাতুর ক্ষয় রোধ করে না বরং এটাকে আকর্ষণীয় এবং চকচকে করে তোলে।

রং করা (Painting): রং করার মাধ্যমেও ধাতুর ক্ষয় রোধ করা যায়। ক্ষয়রোধ করার জন্য আমাদের বাসার রেলিং, শেলফ, গাড়ি কিংবা ইস্পাতের তৈরি বিভিন্ন জিনিসে রং করা হয়ে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রং একসময় নষ্ট হয়ে যায়। তখন এসব জিনিসকে আবার সঙ্গে সঙ্গে রং করে ফেলা ভালো।

মরিচাহীন ইস্পাত

তোমরা কি জানো মরিচাহীন ইস্পাত বা স্টেনলেস স্টিল কী এবং কেন এতে মরিচা পড়ে না? মরিচাহীন ইস্পাত কার্বন, নিকেল এবং ক্রোমিয়ামকে লোহার সঙ্গে মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়। মূলত এটি এমন একটি মিশ্রণ যেটি লোহার চেয়েও কয়েকগুণ শক্ত। মজার ব্যাপার হলো, তাতে মরিচা ধরে না। নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

কাজ: একটি পাতের দুই তৃতীয়াংশ পানি নিয়ে তাতে একটি পেরেক এবং একটি মরিচাহীন ইস্পাত দিয়ে তৈরি একটি চামচ কিছু দিনের জন্য ডুবিয়ে রাখো।

চামচটিতে কোনো প্রকার মরিচা দেখতে পেয়েছ? না, কারণ মরিচাহীন ইস্পাতের ধর্ম সাধারণ লোহার থেকে আলাদা সুতরাং এটি পানি এবং অক্সিজেনের সঙ্গে কোনোরূপ বিক্রিয়া না করায় মরিচার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পেরেকটিতে মরিচার সৃষ্টি হয়েছে কারণ এটি সাধারণ লোহার তৈরি।

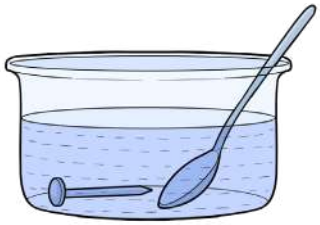

দহন

দহন বলতে এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া বোঝানো হয়, যেখানে কোনো বস্তু অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে আলো এবং তাপ সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবেই এটি একটি অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন। তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবসময়েই দহনের উদাহরণ হিসেবে আগুন জ্বলতে দেখেছ। তুমি যদি একটি মোমবাতি কীভাবে জ্বলে সেটি খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করো তাহলে দহনের ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

মোমের দহন

মোম জ্বলার সময় কিছু অংশ গলে তরলে রূপান্তরিত হয়ে শলিতা (wick) বেয়ে উপরে উঠে পুড়ে যায়। উত্তাপে বাষ্পীভূত মোম অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানিতে পরিণত হবার সময়ে আলো এবং তাপ তৈরি করে। যেহেতু প্রস্তুত হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন এবং পানি উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হওয়ায় আমরা তা দেখতে পারি না। এখানে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, কারণ মোম পুড়ে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি মোম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পদার্থ এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্যও মোম থেকে ভিন্ন।

অন্যদিকে, যে অংশটি গলে গিয়ে নিচে এসে ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধেছে সেখানে রাসায়নিক পরিবর্তন না হয়ে ভৌত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। কারণ, মোম গলে অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং ধর্মের কোনো পরিবর্তন না করেই পুনরায় তা শীতল হয়ে জমাট বেঁধে আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই গলন এবং ঘনীভবন একটি প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন, কারণ এই মোম সংগ্রহ করে সেগুলো দিয়ে আবার নতুন করে একটি মোমবাতি তৈরি করা সম্ভব।

আমাদের বাসায় প্রাকৃতিক গ্যাস এবং লাকড়ি বা খড়কুটো পুড়িয়ে রান্না করাও দহনের উদাহরণ। প্রতিক্ষেত্রেই আলো এবং তাপ উৎপন্ন হয়।

দৈহিক শক্তি

আমরা যে বিভিন্ন ধরনের খাবার খাই তা আমাদের পাকস্থলীতে গিয়ে জমা হয়। হজম হবার পরে পুষ্টি উপাদানগুলো আমাদের দেহে শোষিত হয়। আমাদের দেহকোষে সেসব উপাদান ভেঙে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াটি দহনের মতোই একটি প্রক্রিয়া কারণ, সেটি সম্পন্ন করার জন্য দেহ কোষে রক্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাপের সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি তৈরি হয় আমরা সেসব শক্তি ব্যবহার করে সারাদিন বিভিন্ন কাজ করে থাকি। যদি তাপ শক্তি তৈরি না হতো, আমরা কাজ করার জন্য কোনো শক্তি পেতাম না।

বড় দাবানল, ছোট মোমবাতি কিংবা আমাদের দেহকোষের দহন, সবগুলোই আসলে একধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন।

পানি চক্র, কার্বন চক্র এবং অক্সিজেন চক্র

পানি চক্র (Water cycle)

তোমরা সবাই জানো যে, আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে পানি পেয়ে থাকি। যেমন, বর্ষাকালে বৃষ্টি থেকে আমাদের দেশে পানি আসে। মধ্যে মধ্যে উজান থেকে ঢল নেমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। সেসব বন্যার পানি কোথা থেকে আসে আবার বর্ষা শেষে বৃষ্টির পানি যায়ই বা কোথায়? পরের বছর সেগুলো আবার ফিরে আসেই বা কোথা থেকে?

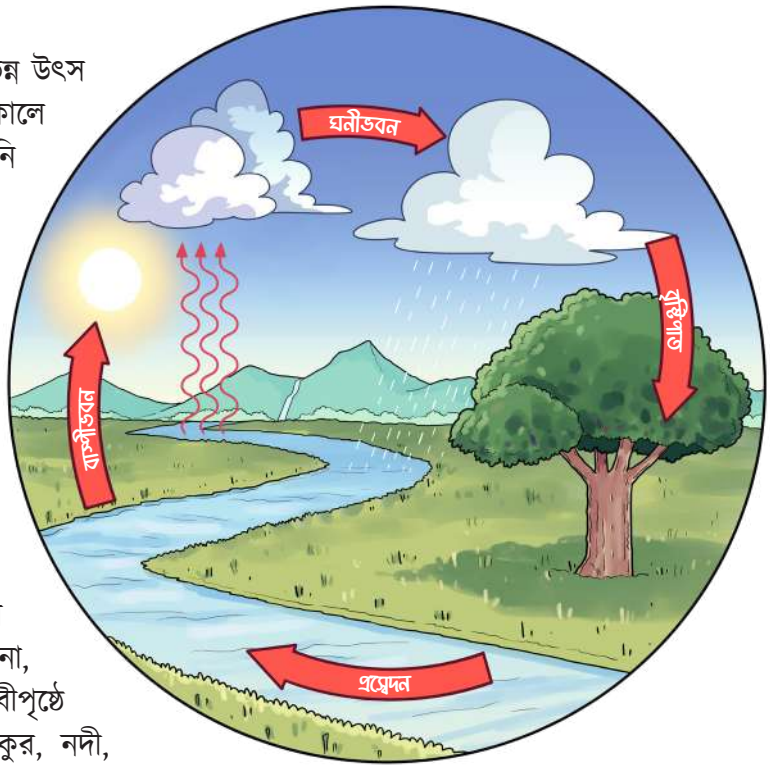

পৃথিবীতে পানি এক উৎস থেকে আরেক উৎসে এলে একটি চক্রের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। তোমরা জানো, কীভাবে বৃষ্টি হয়। সূর্যের তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা পানি বাষ্পে পরিণত হয়। পুকুর, নদী,

সাগর, খালে থাকা পানি থেকে সৃষ্ট সেই জলীয়বাষ্প উপরে গিয়ে শীতল হয়ে পানির কণায় পরিণত হয়। পানির কণাগুলো একত্রিত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে যা আকাশে ভেসে বেড়ায়। ছোট ছোট কণাগুলো একত্রিত হয়ে বড় কণার সৃষ্টি করে যেগুলো পরবর্তীতে বৃষ্টির পানি হিসেবে আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে। মেঘের পানির কণাগুলো যখন খুব বেশি ঠান্ডা হয় তখন তা জমাট বেঁধে বরফের কণায় পরিণত হয় এবং মধ্যে মধ্যে সেগুলো শিলাবৃষ্টি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে এসে পতিত হয়। বৃষ্টির পানি যায় নদীতে এবং ধীরে ধীরে নদী থেকে সাগরে প্রবাহিত হয়। এভাবে ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়ে পুনরায় আবার ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টি হিসেবে ফিরে আসে। এই বৃষ্টির পানি আবার নদীতে যায়, তারপর আবার সাগরে। পানির এধরনের চলাচলকে বলে পানি চক্র, পাশের ছবিতে যেটি দেখানো হয়েছে।

আমরা জানি যে, পানির একটি অংশ মাটির নিচে গিয়ে জমা হয়, সেটাকে ভূগর্ভস্থ পানি বলে। আমরা প্রায়ই সেটা উত্তোলন করে পান করার কাজে, ধোয়ামোছার কাজে এবং সেচের কাজে ব্যবহার করে থাকি।

কোনো কোনো স্থানে বাতাস কিছু জলীয়বাষ্পকে মেঘ হিসেবে বহন করে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায়। মেঘ ঠান্ডা হয়ে সেখানে তুষারের সৃষ্টি করে। গরমকালে সূর্যের তাপে তুষার গলে পানিতে পরিণত হয় এবং পাহাড় থেকে নিচে নেমে আস্তে থাকে। এভাবে, পাহাড়ের ঢালে ছোট ছোট নদীর সৃষ্টি হয়। এসব ছোট ছোট নদী আবার সমতলভূমিতে পতিত হয়ে বড় নদীর সৃষ্টি করে। সবশেষে সেই পানি গিয়ে সাগরে পতিত হয়। ভূপৃষ্ঠের পানি থেকে মেঘ, মেঘ থেকে পাহাড়ের তুষারের মাধ্যমে পানিচক্রে আসে। পুনরায় আবার তুষার গলা পানি নদীতে প্রবাহিত হয়ে সর্বশেষ সাগরে পতিত হয়। এভাবে পানি চক্র আবর্তিত হয়।

পানিচক্রের সঙ্গে জড়িত দুইটি প্রক্রিয়া হচ্ছে, বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবন। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানি নদী-নালা, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি থেকে সূর্যের তাপে বায়ুমণ্ডলে বাষ্পআকারে চলে আসে। এই জলীয়বাষ্প ধীরে ধীরে যখন উপরে উঠে তখন তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকায় জলীয় বাষ্প ঘনীভবনের মাধ্যমে ছোট ছোট পানির কণায় পরিণত হয়ে মেঘে রূপান্তরিত হয়।

পানিচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য দুইটি প্রক্রিয়া হচ্ছে কঠিনীভবন এবং তরলীভবন। বিশেষ ক্ষেত্রে পানি চক্রে ছোট ছোট পানি বিন্দু কঠিনীভবনের মাধ্যমে জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয় যা পাহাড়ের চূড়ায় জমা থাকে। গরমের সময় তরলীভবনের মাধ্যমে এই বরফ গলে পানিতে প্রবাহিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে এই চারটি প্রক্রিয়াই ভৌত পরিবর্তন।

কার্বন চক্র (Carbon cycle)

কার্বন চক্র মূলত দেখায় কীভাবে কার্বন পরমাণু চক্রাকার প্রক্রিয়ায় এক অবস্থা বা মাধ্যম থেকে আরেক অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়। কার্বন চক্রের একটা ছবি পাশে দেয়া হলো।

কার্বন চক্রের প্রধান ধাপগুলো এরকম:

(১) প্রথম ধাপে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদে প্রবেশ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সূর্যালোকের সহায়তায় পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাদের খাদ্য (গ্লুকোজ) এবং আমাদের জন্য অক্সিজেন তৈরি করে।

(২) দ্বিতীয় ধাপে বিভিন্ন প্রাণী এসব উদ্ভিদ ভক্ষণ করে এবং প্রাণীদেহে এই কার্বন পরমাণু সঞ্চিত হয়।

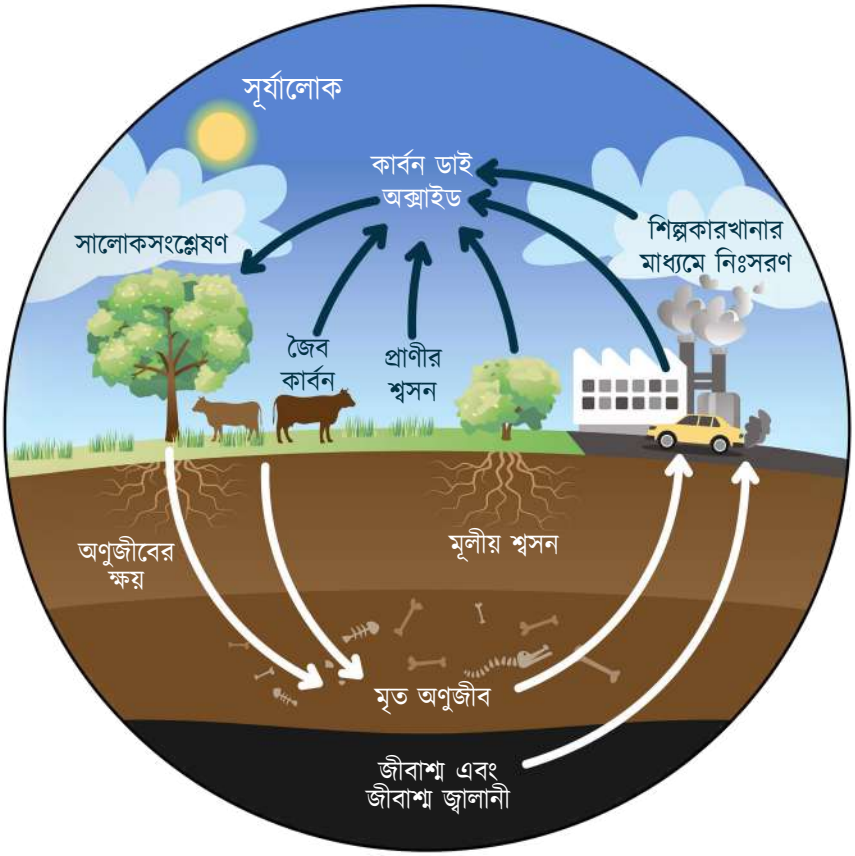

(৩) তৃতীয় ধাপে মৃত্যুর পর এসব প্রাণী এবং গাছপালা ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ভেঙে যায়, তখন তার একটি অংশ সরাসরি কার্বন ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে কার্বন চক্রটি সম্পূর্ণ করে।

তৃতীয় ধাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবাশ্ম জ্বালানিতে রূপান্তর। জীবাশ্ম জ্বালানিতে কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকে এবং সেগুলো পচনশীল উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে তৈরি হয়। মৃত উদ্ভিদের দেহ ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ভেঙে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় মাটির নিচে জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে জমা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কেরোসিন, অথবা পেট্রোল এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়ে থাকে।

(৪) জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা রান্নার কাজে, গাড়িতে, শিল্পকারখানায় এবং আরো অনেক কিছুতে ব্যবহার করে থাকি। জীবাশ্ম জ্বালানি এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানিতে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে চক্রটি সম্পূর্ণ করে।

গাছপালা বা উদ্ভিদ তখন বায়ুমণ্ডল থেকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে পুনরায় চক্রটি শুরু করে।

এ ছাড়াও মানুষের মতো প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদ শ্বসনের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে সমুদ্রের পানিতে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষিত হয়, যেগুলো সামুদ্রিক প্রাণীর মাধ্যমে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কার্বন চক্রটি পানি চক্র থেকে ভিন্ন, এখানে বিভিন্ন ধাপে যে পরিবর্তন হয় সেগুলো কোনোটিই ভৌত পরিবর্তন নয়। কার্বন চক্রের প্রতিটি পরিবর্তনই রাসায়নিক পরিবর্তন।

অক্সিজেন চক্র (Oxygen cycle)

অক্সিজেন চক্র হলো অক্সিজেনের জৈবরাসায়নিক চক্র। এই চক্রটি মূলত বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখার কাজ করে থাকে। তোমরা জানো, উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং নিজেদের জন্য খাদ্য (গ্লুকোজ বা স্টার্চ) সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীকুল উদ্ভিদের ত্যাগ করা অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং অক্সিজেনের সঙ্গে খাদ্যের দহনের মাধ্যমে নিজের জন্য শক্তি উৎপন্ন করে। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীকুল কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, যা উদ্ভিদ পুনরায় তাদের খাবার এবং অক্সিজেন তৈরি করতে ব্যবহার করে।

সুতরাং, এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণ, পানিচক্র, কার্বন চক্র এবং অক্সিজেন চক্র খুব নিবিড়ভাবে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত।

অনুশীলনী ?

১। কাচ, প্লাস্টিক এবং কাগজ ছাড়া তোমাদের চারপাশের পরিচিত আর কী কী জিনিস রিসাইকেল করা সম্ভব?

২। বাসায় রান্নার জন্য নানা ধরণের জ্বালানি ব্যবহার হয়। তাদের মাঝে কোন জ্বালানি কম দূষণকারী? কেন?

৩। যখন একটি মোমবাতি জ্বলে তখন ভৌত এবং রাসায়নিক উভয় পরিবর্তনই ঘটে। পরিবর্তনগুলি কী? এরকম পরিচিত প্রক্রিয়ার আরেকটি উদাহরণ দাও যেখানে ভৌত এবং রাসায়নিক উভয় পরিবর্তনই ঘটে।

৪। যদি বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে কী ঘটতে পারে? কী কী কারণে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে পারে?